নোটবই থেকে শংকর

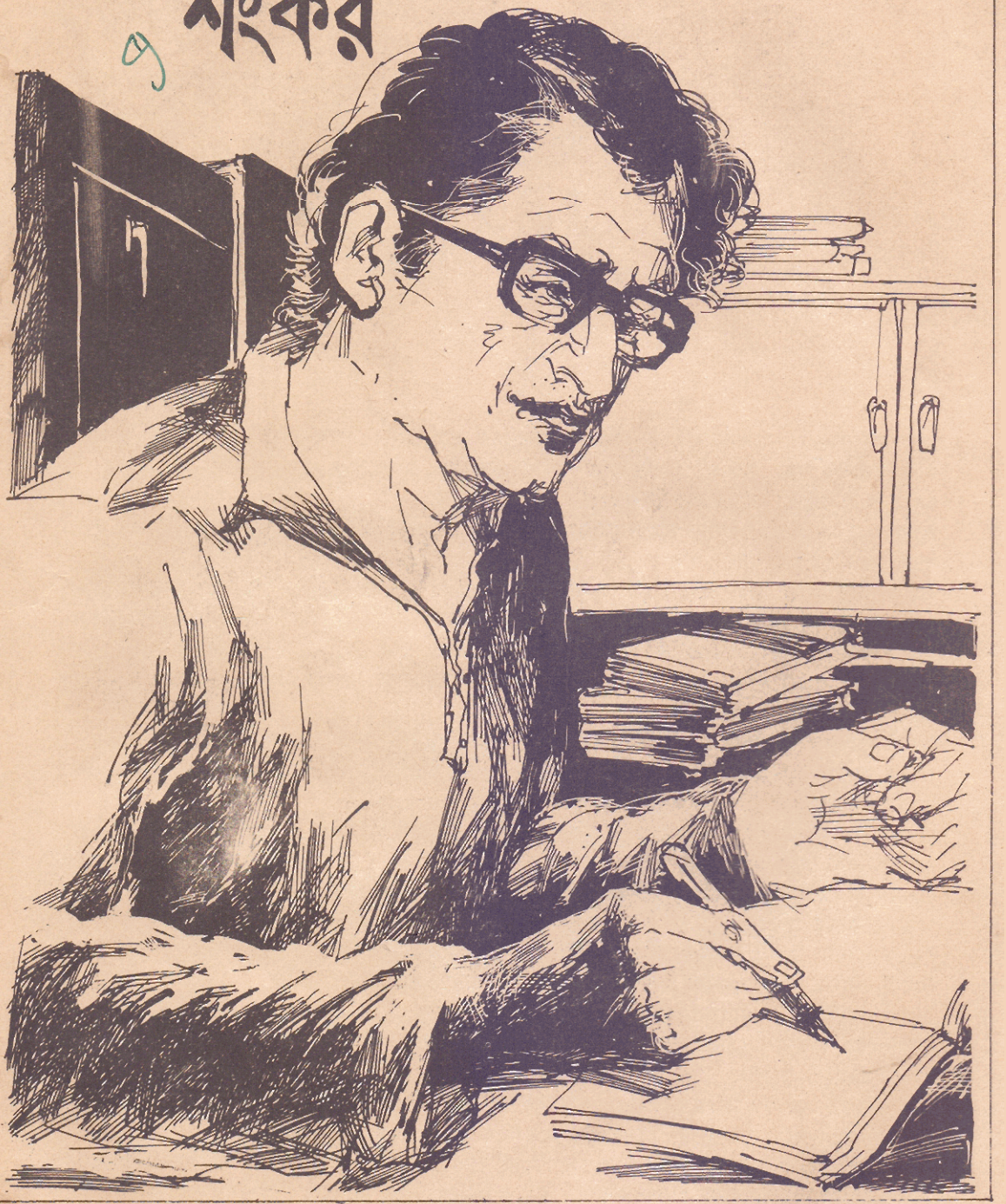

সেবার এতোদিন পরে ওই ভাবে আবার সুমেধার খবর পাবো এবং তার সঙ্গে আবার যোগাযোগের সম্ভাবনা দেখা দেবে তা কখনও প্রত্যাশা করিনি। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত হলদুপুর ইনডাসট্রি থেকে হঠাৎ টেলিফোন এলো তাঁদের অফিসের একজন দূত বিশেষ কিছু সংবাদ নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে চান। আমি বাড়ি থাকছি কিনা।

আমি অবশ্যই বাড়িতে আছি এই কয়েকদিন। স্বেচ্ছায় নয়, বিশ্রামের জন্যেও নয়, স্রেফ শারীরিক কারণে। আমার কোমরের ব্যথাটা বেড়েছে এবং কোমরের এই অশোভন গো-সেবার জন্য গৃহবন্দী হয়ে আছি। আমি যে কাজে সারা জীবন লিপ্ত আছি তাতে কয়েকটি

ছাপাখানার কর্মচারী, কয়েকজন প্রুফ সংশোধক এবং এক আধটি ছোটখাট পত্রিকার সম্পাদক ছাড়া কেউ আমার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করেন না।

"যোগাযোগ রক্ষা করাও সহজ কাজ নয়", আমি পূর্ব-রাত্রেই আমার দিনলিপিতে মন্তব্য করছিলাম। এক সময় স্মৃতি রীতিমত প্রখর ছিল, লক্ষ লক্ষ ছোটখাট ঘটনা, সমপরিমাণ দৈনন্দিন খুঁটিনাটি আমার স্মরণে থাকতো এবং সত্য কথা বলতে কি, তাদের ওপর ভরসা করেই আমি লেখক হিসেবে নানা ঘটনার মালা সাজিয়ে চলেছি। এখন আমার যে জীবনযাত্রা তাতে বেশী মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হয় না, হলেও শত চেষ্টাতেও তাদের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করতে পারি না, ফলে তাদের কথাবার্তা, তাদের ভাবভঙ্গী, তাদের সুখদুঃখ আমাকে তেমন নাড়া দেয় না এবং ফলে সৃষ্টির অঙ্গনে আমি সহজে তাদের আমন্ত্রণ করি না। আমি সন্তুষ্ট থাকি তাদের সঙ্গে মানসিক যোগাযোগ করে, অনেকদিন আগে যাদের সঙ্গে আমার হৃদয়ের যোগাযোগ হয়েছিল। যাদের কান্নাহাসির মেলায় একদিন আমারও একটু প্রবেশের সুযোগ মিলেছিল, যাদের সঙ্গে আমি নিজেও আমার সুখ-দুঃখ কিছুটা ভাগ করে নিয়ে একদা গভীর তৃপ্তি অনুভব করেছি।

অবশ্যই এইভাবে ঘটমান বর্তমানকে কিছুটা অবজ্ঞা করে সম্পূর্ণ অতীতনির্ভর সাহিত্যকর্মের জন্য সবচেয়ে যা প্রয়োজন তা হলো প্রখর স্মৃতি। আমি কর্মবীর নই, পরিব্রাজকের ঝুলি নিয়ে মানুষের তীর্থে-তীর্থেও আমি দীর্ঘদিন ঘুরে বেড়াইনি, আমি কোনো যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করিনি, কিংবা কোনো আন্দোলনে, তবু এক একসময় আমি নিজেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ি এই ক্ষুদ্র জীবনে কত ঘটনাই তো ঘটে গিয়েছে। ভাগ্যে সেই সব ঘটনা ঘটেছিল, না হলে আমার এই সৃষ্টির প্রচেষ্টা, আমার এই অতীত রোমন্থন মূল্যহীন হয়ে পড়তো। আমি জীবনযুদ্ধের বাইরে কী নিয়ে বেঁচে থাকতাম? আমার নিজের কাছেই আমার কোনো মূল্য থাকতো না।

আমি যে-কথা বলছিলাম, যেহেতু অতীতই আমার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ সেহেতু স্মৃতি আমার পক্ষে অমূল্য। অথচ এই স্মৃতি অনেকটা ব্যাটারির মতন। ভাল জিনিস হলে অনেকদিন বেশ শক্তিমান থাকে, আশার অতিরিক্ত কাজ দেয়। তারপর কখন আবার ধীরে—ধীরে তার শক্তি কমতে থাকে এবং এই কমার পর্বে মানুষের দুশ্চিন্তা হয়। ব্যাটারিকে চার্জ দিয়ে পুনরায় শক্তিমান করার উপায় এখন সহজলভ্য। কিন্তু স্মৃতির ব্যাটারিকে সঞ্জীবিত করার পথ কি তা আমার জানা নেই। নিশ্চয়ই কোনো যোগাসন বা ঐ ধরনের প্রক্রিয়ায় কিছুটা লাভ হতে পারে। কোনো যোগব্যায়াম বিশেষজ্ঞকে প্রশ্ন করলে জানা যেতে পারে। কিন্তু এখন আমার লজ্জা লাগে, কারুর কাছে স্বীকার করতে ইচ্ছে করে না আমার মনের ব্যাটারি নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে।

যখন ছাত্র ছিলাম তখন টেস্টপেপারে এবং কিশোর পত্র-পত্রিকায় এক ওষুধের বিজ্ঞাপন বেরুতো। পড়াশোনা করেও যারা মনে রাখতে পারছে না তাদের পক্ষে নাকি মন্ত্রস্বরূপ। দিনে কয়েক চামচ সেবনেই পরীক্ষার সময় মনে রাখার সমস্ত দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি—একেবারে যাকে বলে স্মৃতিধর। আমার বেশ মনে আছে (স্মৃতির ব্যাটারি নিস্তেজ হওয়া সত্ত্বেও) প্রমথেশ একবার ওই ওষুধ আনিয়েছিল। আমি তাকে বলেছিলাম, "ওরে হতভাগা, পাঁজির বিজ্ঞাপনে লেখা থাকে দেখিস না—বিজ্ঞাপনে বিভ্রান্ত হইবেন না। প্রতারকরা সারাক্ষণ সচেষ্ট রহিয়াছেন।" প্রমথেশ তখন বলেছিল, "না ভাই, পরীক্ষায় একটু ভাল ফল করতে হলে অবশ্যই একটু ভাল ব্রেন দরকার।"

আমাদের শ্যামাপদ চ্যাটার্জী হঠাৎ প্রমথেশের ওষুধে ভাগ বসিয়েছিল, বোতলের একটা বড় ডোজই খেয়ে নিয়েছিল। তারপর আমরা ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "হ্যাঁরে, 'মেমারি' কিছু বাড়লো? কিংবা ব্রেনের কোনো উন্নতি বুঝতে পারছিস?"

ফচকে শ্যামাপদ কয়েকবার চোখ খুললো, বন্ধ করলো। তারপর বলল, "স্মৃতি যা ছিল প্রায় তাই রয়েছে।"

"একটুও বাড়তি কিছু মনে পড়ছে না?"

শ্যামাপদ নীরব।

"এই ধর যেসব কবিতাগুলো গতকাল মুখস্ত করেছিলি, সেগুলো?"

শ্যামাপদর করুণ স্বীকারোক্তি, "এক লাইনও মনে পড়ছে না, ভাই। সব গুবলেট হয়ে বসে আছে! স্রেফ একটা পুরনো ইনসিডেন্ট ভুলে গিয়েছিলাম, সেটা ওষুধ খাবার পরে আবার মনে পড়ছে।"

"কী মনে পড়ছে?" আমরা সকলে অবশ্যই আগ্রহী।

"আমার ছ'সাত বছর বয়স, রাস্তায় ড্যাংগুলি খেলার জন্যে বাবা আমাকে চেপে ধরে পেটাচ্ছেন" (শেষ শব্দটি আমার বানানো! শ্যামাপদ যেটি ব্যবহার করেছিল তা এই বয়সে আর মুখে আনা যায় না!)

"ব্রেনের দিক থেকে কোনো উন্নতি?"

দুষ্টু শ্যামাপদ বেশ গম্ভীর ভাবেই জানালো, "ব্রেনটা মনে হচ্ছে খুলছে। ব্রেন বলছে, আমার তখন উচিত ছিল বাবার ধুতির কাছাটা খুলে দেওয়া। তাহলে বাবা কাপড় সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন এবং সেই সময় আমি কেটে পড়তে পারতাম।"

"আঃ, শ্যামাপদ ওতো অতীতের ব্রেন—রিট্রসপেকটিভ এফেক্টে খুলছে। আমরা জানতে চাই এখনকার ব্রেনের কথা।"

হতভাগা শ্যামাপদ করুণ সুরে বলল, "ঠিক আগেকার মতনই ভীষণ বোকা বোকা ফীল করছি!"

প্রমথেশ বলেছিল, "এর কোনোটার জন্যেই আমি ওষুধকে দোষ দেবো না। প্রথমত, বোতলের ওপরেই বড় বড় করে লেখা রয়েছে, সেবনের পূর্বে ভাল করিয়া নাড়িয়া লউন। শেক দ্য বটল বিফোর ইউজ—করেনি শ্যামাপদ। ও বিনা পয়সার জিনিস ঢকঢক করে ওপর থেকে খেয়ে নিয়েছে।"

শ্যামাপদ আবার সেবনের জন্যে বোতলের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল, পরীক্ষার কারণেই তার স্মৃতি দ্রুত প্রয়োজন। কিন্তু প্রমথেশ বোতল সরিয়ে নিলো দ্রুত। "ওরে বাবা, পড়ে দেখ, লেখা রয়েছে—নিয়মিত সেবন ছাড়া প্রত্যাশিত ফল হয় না।"

এই ওষুধের বিজ্ঞাপনেই আর একজন ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বিশেষ কৃতী ছাত্রের সার্টিফিকেট ছাপা হতো যাতে তিনি নির্দ্বিধায় স্বীকার করছেন, পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার পিছনে এই ওষুধের অবদান রয়েছে। অনেকদিন পরে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল—এক সরকারী অফিসে মধ্যম পর্যায়ে কাজ করছেন। কিন্তু ভদ্রলোককে ভীষণ ভুলো-ভুলো মনে হলো।

সুতরাং এতোদিন পরে ওষুধের মোহে পড়ার কোনো অর্থ হয় না। শ্যামাপদর মতন অতীত সম্পর্কে কোনো রিট্রসপেকটিভ বুদ্ধিমত্তাও আমার প্রয়োজন নেই। যা হবার তা তো হয়েছে, বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে গতস্য শোচনা নাস্তি। অতীতকে দুমড়ে নিজের পক্ষে আনবার অযথা চেষ্টা না করে, অতীতের অভিজ্ঞতায় বলীয়ান হয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে অর্থপূর্ণ করে তোলাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

আমার বর্তমান সচল—দ্রুতবেগ না থাকলেও গাড়ি আটকে যায় নি। আমার মতন মানুষের পক্ষে এই যথেষ্ট। নানা সমস্যায় সংকীর্ণ এই জীবনপথে আশি মাইল স্পীডের বর্তমান নিয়ে আমি কী করবো?

আর ভবিষ্যৎ? ভবিষ্যৎ একটা অবশ্যই আছে, কিন্তু ভবিষ্যৎকে নিয়ে কোনো রঙিন স্বপ্নের মালা গাঁথবার বয়স তো আমরা অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছি। ওই যে ওষুধের বিজ্ঞাপনের নায়ক দীর্ঘদিন পরে পরিণত বয়সে আমাকে বললেন, "যাবার সময় তো হয়ে এলো। এখন মনে রেখে কী হবে? যত ভোলা যায় তত ভাল।"

আমি ওঁর কথার মধ্যে অন্তরিকতার স্পর্শ পেয়েছি, কিন্তু তবু ওঁর সঙ্গে একমত হতে পারিনি। বর্তমান নিয়ে যে ব্যতিব্যস্ত নয়, ভবিষ্যতে মোটা লগ্নী করা যার পক্ষে সঙ্গত নয়, অতীতই তো তার একমাত্র অবলম্বন। সে-অতীতে যদি নানা ঘটনায় পরিপূর্ণ থাকে তবে কেন সে রোমন্থন করবে না?

কিন্তু ওই যে স্মৃতির পড়ন্ত ব্যাটারি! যে কোনো জিনিসকে মনের পর্দায় টেনে আনতে স্পার্ক প্রয়োজন, অন্ধকারের বুক ভেদ করার জন্যে কিছুটা আলোর প্রয়োজন।

স্মৃতি যদি অতীতের গুরুভার বহন করতে কিছুটা নিরুৎসাহ হয় এই আশংকায় আমি হাতের গোড়ায় একটা প্রমাণ-সাইজের কাপড়ে বাঁধানো নোটবুক রেখেছি। অসুস্থ অবস্থায় বন্দী দেহ যখন অধৈর্য হয়ে ওঠে, যখন কেউ কাছে থাকে না, তখন আমি নোটবই খুলে নানা ভাবনা চিন্তা লিপিবদ্ধ করি। হাল্কা মেঘের টুকরোর মতন নানা চিন্তা ভেসে আসে, যাদের মধ্যে অনেক সঙ্গতি নেই, ধারাবাহিকতা নেই। তবু আমি তাড়াতাড়ি কয়েকটা প্যারাগ্রাফ লিখে ফেলি, যাতে স্মৃতির ওপর অতিরিক্ত চাপ কমে যায়। যা একবার লিপিবদ্ধ করেছি, তা তো আর মনে রাখবার প্রয়োজন নেই। যে স্মৃতি এতবার সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে লেখকের কাছে তা বোঝাস্বরূপ—অকারণে তাকে চিরদিনের মতন বহন করে চলার কোনো মানে হয় না।

এই যে নোটবই লিখি—এ যেন সবার অলক্ষ্যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সঙ্গে কথা বলা। নিজেকে কিছুটা হাল্কা করে নেওয়া।

এইভাবে লেখায় আমি ভীষণ রিলিফ বোধ করি। কারুর প্রতি কোনো দায়দায়িত্ব নেই এই টুকরো লেখায়। কাউকে সন্তুষ্ট করা, কাউকে আনন্দ দেওয়া, কাউকে প্রভাবান্বিত করতে চাই না আমি। কোনো আইন আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না। মানহানি, আদালতের অসম্মান, দেশের সংহতি বিপন্ন করা ইত্যাদি শতসহস্র দুশ্চিন্তা যা লেখককে সারাক্ষণ ঘিরে থাকে, তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। আমি প্রত্যেকের নাম ধরে, কোনোরকম দায় দায়িত্ব না নিয়ে যা খুশী লিখে যেতে পারি—কারণ এ লেখা প্রকাশিত হবার জন্যে নয়।

আসলে আমি যা আবিষ্কার করছি, ছাপার জন্যে লেখা এবং নিজের জন্যে লেখার মধ্যে অনেক তফাৎ। কোনো একজন লেখক মদের নেশার ঘোরে আমাকে বলেছিলেন, "ছাপার জন্যে যা লেখা তা লেখাই নয়—বাজারের মেয়ে আর ঘরের মেয়ে কী এক জিনিস?"

আমি এই লেখকের কথা শুনে কানে আঙুল দিতে যাচ্ছিলাম। তখন ওই মদমত্ত লেখক বলেছিলেন, "এই কথা আমি একজন বন্ধুকে বলতে পারি, কিন্তু যখন লিখবো তখন আমি নিজেই অনেক সাবধান হয়ে যাবো। কোনো রুচিশীল পাঠক অথবা পাঠিকার বিরূপভাজন হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ ওঁদের পকেটেই মানিব্যাগ, ওঁদের আঁচলেই টাকা, এবং আমাকে লিখে বেঁচে থাকতে হবে। সুতরাং আমি তখন হয়তো ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখবো। প্রকাশিত হবার জন্যে যা

ধ্যে সম্পূর্ণ আন্তরিকতা থাকা কোনোক্রমেই লেখা তারে ? হয়তো কিছু লোক ব্যাপারটা বুঝবে, কিন্তু ওই দুই ধরনের মেয়ের মধ্যে তুলনা ওর ফোর্স খায় পাওয়া যাবে না।"

মত্ত অবস্থার কথা। সম্পূর্ণ গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়, একটু চিমটে নুন মিশিয়ে প্রকৃত অর্থ আস্বাদ করা ভাল, কিন্তু কথাটার মধ্যে বেশ কিছুটা সত্য আছে।

আমি যেমন হঠাৎ নোটবইতে কলকাতা শহরের ধারাবাহিক অধঃপতন সম্পর্কে কিছু বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছি। লিখেছি, "এ শালার শহর গোল্লায় যেতে বাধ্য। এ-শহরের ম্যানেজমেণ্ট থেকে বাঙালীদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বিদেয় করে দেওয়া উচিত কিছুদিনের জন্যে। সেই ১৯২৪ সাল থেকে মুখেন-মারিতং জগৎ বঙ্গপুঙ্গবরা অনেক চান্স পেয়েছেন—কিন্তু কিসসু করতে পারেননি। ধারাবাহিক ভাবে কোনোকিছু পরিচালনা করার শক্তি, ধৈর্য এবং নিষ্ঠা যাদের নেই কোনো মহানগরী তাদের হাতে থাকা উচিত নয়। ক্যালকাটা ইজ টু প্রেসাস টু বি লেফট্ টু 'অপদার্থ'জ' অ্যাণ্ড 'অকর্মণ্যজ'।"

এই ধরনের বাংলায় এই টাইপের মন্তব্য আমি কোনো প্রকাশিতব্য রচনায় করতে পারতাম ? এই ভাবনাকেই an সৌজন্যে ডবল-রিফাইন করে ark সম্পাদকের কাছে পাঠাতাম যাতে একূল-ওকূল দুকূল নষ্ট হতো।

এই সাবজেক্টেই আমি নোটবইতে লিখেছি, "স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দের পর্যন্ত মুখের বাঁধন ছিল না। চিঠিপত্তরে যেসব উত্তর কলকাতার ডায়ালগ তিনি ব্যবহার করতেন অবিরত তা এখনও পাবলিকের কানে পেঁছয়নি। ফিলটার করা শব্দ নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। যেমন আমি একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির কাছে শুনেছি। একটি চিঠিতে বিবেকানন্দর মত মহাত্মা লিখছেন, 'ভাই অমুক (ইনিও খুবই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি) কখনও তো একটি বাল ছিঁড়িয়াও আমার উপকার করিতে চাও না, দয়া করিয়া এবার 'অমুক' কাজটি করিবে…ইত্যাদি ইত্যাদি।' এই লেখা তো প্রকাশের জন্য atw হয়নি, মাত্র একজন ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগের জন্যে লেখা হয়েছিল। এই ভাষার জোর অনেক।

আমি নোটবই খুলে হঠাৎ লিখলাম : "কোটি মানুষের শহর আমাদের 4 কলকাতা, কিন্তু এখানে কারও সঙ্গে কারও যোগাযোগ নেই। কর্তাব্যক্তিরা চান না যোগাযোগ থাকুক ! মানুষ যত বিচ্ছিন্ন হবে ততই তাদের বাগে আনার সুবিধে। ইনডিভিজুয়াল অথচ বেয়াড়া এমন লোকের সংখ্যা সমস্ত ইতিহাস খুঁজলেও হাতে গোণা যায়। যেমন বুদ্ধ—একা-একাই কোনো গুরু-ফুরুর সাহায্য না নিয়েই অসংখ্য সামাজিক বিভ্রান্তির ফাঁদ এড়িয়ে সত্যকে খুঁজে বার করলেন।

যেমন গান্ধি—নিজের পায়ে ভর করে একলা চলার অদ্ভুত ট্রেনিং। যেমন কিছুটা সুভাষ বসু—যে পথে যাবার গোঁ ধরলেন সেখানে একলা হাজির হবার হিম্মত রেখে-ছিলেন। সাধারণ মানুষ তা পারে না—যেদিকে বেশী লোকজন সেদিকেই অন্য সবাই যোগ দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে ma।, সামাজিক জীব তো r একলা থাকতে ভীষণ অনিচ্ছা। সেই জন্যেই তো রাজশক্তির মোক্ষম দাওয়াই কারাগারের নির্জন কক্ষ—যেখানে কত বিদ্রোহীর দুর্জয় প্রতিজ্ঞা ভেঙে দুমড়ে গিয়েছে। প্রাচীন যুগে সন্ন্যাসীরা ও নিঃসঙ্গতায় অভিজ্ঞ হতেন উপলব্ধির শিখরে পেঁছনোর জন্যে—কিন্তু এই স্বেচ্ছা নির্জনতা ও শাসন-নির্জনতার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ।"

আমার কোনো বাধা নেই, আমাকে কোনো দায়িত্বের বোঝা বহন করতে হচ্ছে না। তাই আমি মনের সুখে নোটবইতে লিপিবদ্ধ করেছিলাম : এ এক err—মহানগরী। সংখ্যাহীন জনবসতি। এই ক'বছরেই নতুন এক শতাব্দীতে পেঁছতে হবে, কিন্তু এখানকার রাজপথ প্রাগৈতিহাসিক, প্রাচীন বন্য পুরুষের মতো এরা আলো তৈরি করতে অনভ্যস্ত। এখানে যানবাহনের গতি নেই, এখানে দূরভাষণের যন্ত্র আছে কিন্তু তা সারাক্ষণ অচল—নিজের শ্বাসযন্ত্রের শক্তিতে যতটা বিস্তারিত করা যায় কণ্ঠস্বর ততদূর প্রসারিত হয়। সামাজিক মানুষকে এক সঙ্গে রেখেও তাদের একলা করে তোলার পক্ষে এমন চমৎকার ব্যবস্থা পৃথিবীর অন্য কোথাও অকল্পনীয়। যাঁরা এটা সম্ভব করেছেন তাঁদের 'খুরে' নমস্কার। না, না তাঁদের খুর বাঁচাতে যাবে কেন ? তাঁদের শ্রীচরণেই নমস্কার—এই চর্চিত-চরণ যুগলেই আরও এক ঘটি জল ঢেলে দেবার জন্যে কত মানুষের কত ব্যাকুলতা।"

এই ভাবে লিখলে আমার রাগ কমে যায়। এই যে চন্দ্র পৃষ্ঠের মত কলকাতার পথঘাট, এই যে অষ্টপ্রহরের যানজট, এই যে টেলিফোন বিভ্রাট, এই যে লোডশেডিং নারকী মহিষাসুরের দাপট সব সহ্য করেও আরও অনেকদিন বেঁচে থাকবার ইচ্ছা জন্মায়। আর যোগা-যোগ না-হয় বিচ্ছিন্ন হলো. কিন্তু একখানা নোটবই mad গোড়ায় রেখে আমরা সকলেই অন্তত নিজের সঙ্গে একটা যোগসূত্র স্থাপন করতে পারি—নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করাও তো এই জটিল যুগে একটা দায়িত্ব। মনের এই অবস্থাতেই কর্তব্যকমে" ow—— ওপর রাগ কমতে শুরু করে। আমি এঁরা তো —— লোক। আমার মধ্যে যে বিশ্বশক্তি উপস্থিত সে-ই তো ওঁদের মধ্যে সমানভাবে রয়েছে—এই আত্মাকেই তো অবিনাশী এবং পূর্ণ থেকেও পূর্ণতর বলা হয়েছে। চিরপূর্ণ এই ভাণ্ড থেকে বিরক্ত আমি যতই বিয়োগ

করি, আমার [redacted] প্রচেষ্টার শেষে সেখানে পূর্ণই বিরাজ করবেন।

আবার মানসিক বিরক্তি আমার! নোটবই খোলাই রয়েছে। আমি ঝটপট লিখলাম—"মালেরা এসব জানে বলেই বোধহয় এতো কুঁড়েমি, অপদার্থদের এতো ঔদ্ধত্য। হে ঈশ্বর, এরা জানে না এরা কী করতে পারছে না। এরা জানে না অনেক দেশের সভ্য মানুষ শত শত বছর আগেই রাস্তা তৈরি করে 'ST রক্ষণাবেক্ষণ করতে শিখেছে। বহু দেশ গত শতাব্দী থেকেই বিদ্যুৎ ব্যবহারে সুপটু হয়ে উঠেছে। কানের কাছে একটি ছোট্ট যন্ত্র ধারণ করে উনিশ শতাব্দী থেকেই সুসভ্য মানুষ দূরকে কাছে টেনে আনতে সক্ষম হয়েছে।"

আবার আমার রাগ কমে যায়। ভাবি অহেতুক বিরক্ত হবো না—বিরক্ত মানুষ সৃষ্টিকার্যের [redacted] শ্রেষ্ঠ নয়। বিরক্ত থেকে ধ্বংস হয়, অনাসৃষ্টি হয়, উত্তাপের [redacted] হয়। মনে রেখো অপ্রয়োজনীয় উত্তাপ মানেই শক্তিক্ষয় —এনার্জির অপচয়। সেই আদ্যিকালে যে ভদ্রলোক প্রথম বিশ্বকে জানিয়েছিলেন আনন্দই হচ্ছে সৃষ্টির উৎস তাঁর ঘটে অনেক [redacted]। কলকাতার ক্যাচ-ক্যাচানিতে পড়লে এই মূল্যবান কথা তাঁর মাথায় আসতো না। কলকাতা থেকে যে যত দূরে সরে যাবে সে তত ভাল করবে, আমি আবার হুড়মুড় করে লিখে ফেললাম।

তারপর মনে পড়তে লাগলো পুরনো দিনের কথা। এইতো সেদিনও কী সুন্দর শহর ছিল এই কলকাতা। সুঠাম লাবণ্যময় শরীর, কোথাও কোনো মেদাধিক্য নেই, বাড়তি কোনো চাপ নেই। [redacted] মানুষদের শহর যেমন

হওয়া উচিত। তখনও আমরা রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ কেমন করে করতে হয় ভুলে যায়নি, তখনও আমরা জানতাম কেমন করে যানবাহনের শৃঙ্খলা রক্ষা করে নগরীকে চলমান রাখতে হয় এবং সবচেয়ে যা প্রাথমিক তখনও আমরা জানতাম কী করে শহরের রাস্তা ধরে চলা-ফেরা করতে হয়। প্রমথেশ, আমি, সুমেধা ও বন্ধুরা কO দীর্ঘ সময় ধরে এই শহরের অলিগলিতে ঘুরে বেড়িয়েছি—তখন সত্যিই ছিল পথ চলাতে আনন্দ।

আর এখন? ভাবলেই ভয় হয়—পাগল এবং ধর্মের ষাঁড় ছাড়া আর কেউ নিজের খেয়ালে এই শহরের পথ ধরে ঘুরে বেড়ায় না। শস্তার পতিতা থেকে সৎ নাগরিক পর্যন্ত সবাই নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিতান্ত বাধ্য হয়েই পথে দাঁড়িয়ে থাকে হয় খরিদ্দার অথবা যানবাহনের প্রতীক্ষায়।

আমার মনে আছে, শ্যামশ্রীর এক বিদেশী বান্ধবী, জোয়ান সেবার কলকাতায় এসেছিল। দিনের পর দিন আমাদের পথপরিক্রমার সঙ্গী হয়ে এই শহরকে ভালবেসেছিল এবং মহানগরীতে পদযাত্রার আনন্দ সম্পর্কে ইংরিজীতে প্রবন্ধ লিখেছিল। সেই বিদেশিনীর মতে দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করে এতো বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ পৃথিবীর কোথাও নেই। জোয়ান যদি আবার ফিরে আসে তাহলে খুব কষ্ট পাবে। সে নিজের চোখে দেখতে পাবে পদযাত্রী এবং চতুশ্চক্র যানের সারথীর মধ্যে এমন পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং তীব্র বিদ্বেষ পৃথিবীর কোথাও নেই। যারা গাড়িতে তাদের প্রতি ঘৃণা পথের নাগরিকদের, আর পথ সম্পর্কে সব আশা ছেড়ে দিয়ে বসে আছে ড্রাইভার। মানুষ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ভালবাসা নেই তার মনে।

একজন ড্রাইভার সেদিন দুঃখ করে আমাকে বললেন, "মাকে খুন, বাবাকে অন্ধ করে দেওয়া ইত্যাদি অপরাধ পূর্বজন্মে না করলে কেউ এই শহরে বাস ড্রাইভার হয় না। জঘন্য পাপীদেরই রৌরব নামক নরকে না পাঠিয়ে এই শহরে হয় ড্রাইভার, না হয় কণ্ডাক্টর, না হয় ট্রাফিক কনস্টেবল করে পাঠানো হয়।"

একজন ড্রাইভারের মুখে এমন কথা প্রত্যাশা করিনি। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, "ওই যে জার্মান যুদ্ধপরাধী হেস্ সায়েবকে এতো হাঙ্গামা করে মিত্রপক্ষ আজীবন বন্দী করে রেখেছে এসব কিছুই দরকার ছিল না। লোকটাকে প্রতিদিন সকাল এগারোটার সময় হাওড়া স্টেশন থেকে মহাত্মাগান্ধি রোড am শিয়ালদহ পর্যন্ত একটা বাস mica বললেই বেশী শাস্তি হতো। যদি আরও শাস্তি দিতে চায় তাহলে চিৎপুর রোডে চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে—চালাও গাড়ি!"

এমন জ্ঞানী ড্রাইভার কলকাতা শহরেই পাওয়া যেতে পারে। ব্যাপারটা আশ্চর্য নয়, কারণ পি. এইচ-ডি করেও পুলিস-সিপাই হয় এই শহরের নাগরিক। এখানকার ম্যাগাজিন হকার মুখে মুখে ছড়া তৈরি করে। এখানকার ভিখিরি যে ছবি আঁকে তা চিত্রপ্রদর্শনীতে যেতে পারে। এখানকার পকেটমার দুই ট্রিপের মাঝে সুরেলা সুরে গান গায়। এখানকার রাস্তার আলোর নিচে দাঁড়িয়ে-থাকা নিকৃষ্ট পতিতার ব্যাগেও বাংলা গল্পের বই থাকে। এখানে সবই সস্তা। সস্তা নয় শুধু সসম্মানে জীবন অতিবাহিত করে—একটা বিরাট জট-পাকানো সুতোর গুলির মতন কলকাতার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এবং সবচেয়ে যা মজার কেউ জানে না কলকাতার জন্যে দায়ী কে।

আমি আমার নোটবইতে লিখে ফেলেছি, "রাজভবনে বসে আসমুদ্র-হিমাচলের প্রধানমন্ত্রী নগরীর বিদ্বদ্জনদের সেদিন প্রশ্ন করলেন, 'এই শহরের দায়িত্ব কার?' লালদিঘীর ধারে পৃথিবীর বৃহত্তম কাছারিবাড়িতে যাঁরা বসে আছেন তাঁদের ধারণা দিল্লীর কুনজরেই কলকাতার জট জটিল হচ্ছে।"

যেখানে যত শক্তিমান মানুষ রয়েছেন বিভিন্ন দায়িত্বে, তাঁরা সকলেই বলছেন, 'কলকাতার দায় আমাদের নয়, আপনাদের।' ধনীরা বণিকসভার সভাগৃহে বসে বলছেন কলকাতা ডুবছে। অর্থাৎ কলকাতা ধুঁকছে, কলকাতা wan—ma; মরার সময়েও কলকাতার দাম বাড়ছে।

যাঁদের দূরদৃষ্টি আছে, ইতিহাস বোধ আছে, তাঁরা বলছেন, আশ্চর্য হবার কিছু নয়, অসুস্থ গোরুর চেয়ে মরা গোরুর অবশ্যই দাম বেশী। চামড়া, হাড়, সিং এসবের আন্তর্জাতিক বাজার রয়েছে, এক্সপোর্ট হবে, ডলার আসবে, মার্ক আসবে, ইয়েন আসবে, রুবল আসবে, কোনো চিন্তা নেই! যেমন কলকাতায় আসছেন দেশ-বিদেশের লেখকরা—আনন্দনগরীর অন্তর্জলী যাত্রা দেখতে। এঁদের উপায় কী? বৃহৎ এক জনপদের সুনিশ্চিত অধঃপতনের এমন চাক্ষুষ ধারাবিবরণী আর কোথায় পাওয়া যাবে? কলকাতা তুমি যেমন মরছো তেমন মরো, আস্তে আস্তে অথচ নিশ্চিত ভাবে, সোমা বাট লিখুন। দুর্ভিক্ষের ছবিতে দেখেছি, অনাহারে শরীর কঙ্কাল, কিন্তু কোনো বিষক্রিয়ায় পা দুটো ফুলে ঢোল। কলকাতারও তেমনি অবস্থা, সর্বত্র চর্মসার wit, কোথাও কোথাও বিপুল স্ফীতি! যাঁরা দেখতে এসেছেন তাঁদের পক্ষে এটা ভাল, খানিকটা বৈচিত্র্যের স্বাদ পাওয়া যায়।

আমার মনে পড়ছে is বয়সে পথপরিক্রমার সময়েও আমরা এইভাবে বিক্ষুব্ধ আলোচনা চালাতাম। কেবল তখন আমরা শহর সম্বন্ধে এতো চিন্তান্বিত — উঠিনি, আমরা ভাবতাম সমস্ত দেশের কথা। সুরজিৎ তখন খুব ফচকে ছিল। সে বলতো, "শুধু দেশের কথা ভাবলেই

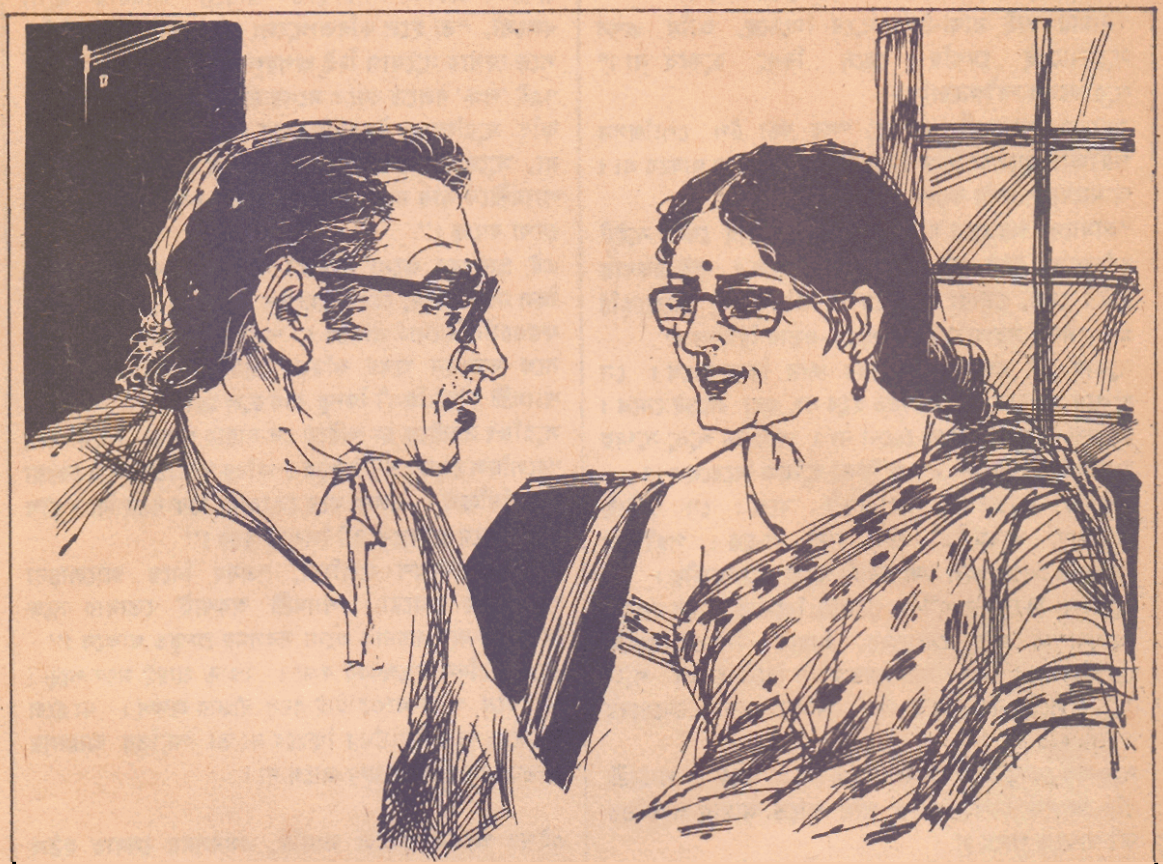

হবে না, আমাদের কলেজের সহপাঠিনীদের কথাও ভাবতে হবে।''

আমার পক্ষে সেটা তখন অনধিকার চর্চা, কারণ আমি তখন জীবন-সংগ্রামের জাঁতায় পিষ্ট হতে শুরু করেছি। আমি বুঝছি, আমার পক্ষে আর কলেজে পড়াশোনা সম্ভব হবে না। সেই ভোর চারটে থেকে উঠে আমাকে প্রাইভেট টিউশনী করতে হয়, তবু আমার সংসারের অভাব মিটবার কথা নয়। আমাকে একটা চাকরি করতেই হবে।

প্রমথেশকে শুনিয়ে সুকান্ত, সুরজিৎ ear বলতো,"আমরা পড়াশোনাও war আবার বান্ধবীদের রূপও ভাববো। না-হলে এই কলেজে em লাভ কী হলো?"

শ্যামশ্রীর সঙ্গে তখনই সুরজিতের কিছুটা জানাশোনা হয়ে গিয়েছে। সে রেগে বলেছে, "তোমরা সারাক্ষণই মেয়েদের কথা ভাবতে পারো, কেউ আপত্তি করবে না।"

সুরজিৎ ভীষণ ফ্ল্যাংক। সে বলেছে, "তাহলে ব্যাপারটা মন্দ হতো না, কিন্তু যে-ছেলে পড়াশোনা করে না মেয়েরা তাদের পছন্দ করবে না। মেয়েরা চায় টেরিকটন বয়েজ। ৬৭%. ভাল টেরিন এবং ৩৩%. দুষ্টু ছেলে।"

"হ্যাঁ, প্রত্যেক মেয়ে তোমার কানে কানে ছেলেদের ফর্মুলা বলে গিয়েছে।" শ্যামশ্রী আবার প্রতিবাদ জানিয়েছে।

"ছেলেরা কীরকম মেয়ে *ma* me তোমাদের জানা উচিত," বলেছে সুরজিৎ।

"তাও আমাদের জানা আছে। মেয়েরা হবে হানড্রেড পারসেন্ট পিওর—তাদের মধ্যে কোনো খাদ থাকবে না, তবেই তোমরা তাদের পছন্দ করবে। এমন মেয়ে আমাদের ক্লাশে একটাই আছে। তার নাম সুমেধা।"

সুমেধার নাম শুনে আমার বন্ধুদের নাড়ির গতি দ্রুততর হলো। অসামান্য সুন্দরী এই সুমেধা। দীর্ঘাঙ্গিনীও বটে। অত্যন্ত ডেলিকেট অথচ ধারালো চেহারাখানি। বাঙালী মেয়েরা সাধারণতঃ এমন ফর্সা হয় না। দুটি চোখ যেন সত্যিই পদ্মফুল। সেইসঙ্গে বিশাল চুল। একদিন খোপা না বেঁধেই কলেজে এসেছিল। আমাদের সুকান্ত নিজেকে আর সংযত রাখতে ma h। বলেছিল, "শিবঠাকুরের জটার প্রয়োজন নেই, আমরা ah চুলেই গঙ্গাকে মর্তে নামিয়ে আনবো।"

একটু দূরেই বসেছিল প্রমথেশ ব্যানার্জী। "প্রমথেশ তুই একটা কিছু বল," আহ্বান জানিয়েছিল সুরসিক সুরজিৎ। প্রমথেশ তখন খাতায় নোট লিখছে। সে কোনোরকম near দেখায় নি। বরং বকুনি লাগিয়েছে,

"নোট্‌সগুলো লেখ্‌ তো, সামনেই ক্লাশ টেস্ট।"
"আমার ভাই মাথা-টাথা ঘুরে গিয়েছে, আমি এখন সুমেধাকেই দেখছি। ব্রেনে কিছু ঢুকবে না।" সুরজিতের স্বীকারোক্তি।
প্রমথেশ ব্যানার্জী বলেছে, "সব কটা টপ পোজিসন পরীক্ষায় মেয়েরা নিয়ে নিলে আমাদের মুখ থাকবে না। আমাদেরও চেষ্টা করতে হবে।'
"আমাদের পরাজয়ে যদি ওদের জয় হয় তার থেকে সুইট অভিজ্ঞতা আর কী হতে পারে প্রমথেশ? তুই একবার ভেবে দেখ, তোরা কেউ চেষ্টা করছিস না! প্রত্যেকটি মনের মতন সহপাঠিনীকে ওয়াক-ওভার দিচ্ছিস।"
সুকান্ত ওই মহলের ভিতরের খবর কিছু রাখে। সে বলেছে, "ওয়াক-ওভার দিতে হবে না, ওরা লড়েই নেবে। তোমরা সুমেধা রায়কে চেনো না। ভগবান শুধু সুন্দর খোলসটাই দেন নি, মগজে কিছু বুদ্ধিও দিয়েছেন।"
প্রমথেশ যুক্তিসঙ্গত কথাবার্তা বলে। সে চাইছে ছেলেদের ভাবমূর্তি যেন নষ্ট না-হয়। পরীক্ষায় মেয়েদের থেকে ভাল ফল করাটা খুবই প্রয়োজনীয়।
সুরজিৎ কিন্তু দার্শনিক চিন্তায় বিভোর। সে বলছে, "যুগযুগান্ত ধরে মেয়েদের আমরা পিছনে ফেলে রেখেছিলাম। এখন আমাদের মূল্য দিতে হবে। শুধু এই কলেজে নয় সর্বত্র সর্ব বিষয়ে এখন মেয়েদের জয়জয়কার।"
সুকান্তর ফোড়ন: "হেরেও সুখ আছে ভাই। শ্যামশ্রী যদি অনেক বেশী নম্বর পায় তাতে আমার আপত্তির কী থাকতে পারে?"
এরপর সুরজিৎ সুদীর্ঘ এক কবিতা রচনা করেছে— কোনো শুভ্রাবরণার কালো কেশ নিয়ে। সেই কবিতা প্রমথেশকে পরের দিন পড়তে দেওয়া হয়েছে। বিরক্ত প্রমথেশ আবার বলেছে, "অর্ডিনারি ব্যাপারে কেন সময়ের অপচয় করছিস?"
সুরজিৎ বলেছে, "তুই তো জানিস বাংলা কবিতা আমার আসে না। কিন্তু গতকাল বাল্মিকীর কবিত্বলাভ হলো। আমি ওই কৃষ্ণকেশী শুভ্রাবরণাকে বলতে চাইলাম আজ তুমি বৈপরীত্যে বিকশিত হচ্ছো, তুমি ভাগ্যবতী। কিন্তু একদিন যখন তোমার কেশও শুভ্র হবে সেদিনও তুমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে— ঈশ্বর তোমার প্রতি বড়ই পক্ষপাত করেছেন, হে সুন্দরী।"
প্রমথেশ তরুণ কবিকে সংযত করেছে। বলেছে, "কেন হাঙ্গামায় যাচ্ছিস? কাব্য রচনায় শক্তি নষ্ট না-করে বাংলা টেকস্টবইগুলো মন দিয়ে পড়।"
আমার মনে আছে সুরজিৎকে তখন কাব্যরোগে পেয়েছে। প্রতিদিনই সুমেধার উদ্দেশে এক একটি কাব্য রচনা করে চলেছে। যদিও কোনো মেয়ের নাম থাকে না।
প্রমথেশ একদিন পরিস্থিতি আয়ত্তে আনবার জন্যে বললো, "তা হলে কবিতাগুলো যথাস্থানে পাঠিয়ে দিই! পড়ে দেখার সুযোগ দিই অপরপক্ষকে।"
"এই 'পক্ষ' বলতে কাকে মনের মধ্যে রেখেছো, ব্রাদার?" কবি সুরজিতের উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন।
না, সুমেধাকে পাঠাচ্ছে না প্রমথেশ! "আমি পাঠাচ্ছি শ্যামশ্রীকে যার সঙ্গে তোমাকে প্রায়ই একটু আধটু ঘুরতে দেখা যাচ্ছে।"
এই প্রস্তাবের জন্যে বেচারা সুরজিৎ মোটেই প্রস্তুত ছিল না। মৃদু হেসে প্রমথেশ বলেছিল, "সঙ্গে একটা ফরওয়ার্ডিং নোট থাকবে। শ্যামশ্রী জানবে কবি কার সঙ্গে ঘুরছেন অথচ কবিতা লিখছেন কার সম্বন্ধে!" শ্যামশ্রী দীর্ঘাঙ্গিনী কিন্তু তার চুল ছোট।
সুরজিৎ সবাইকে চা খাইয়ে সে-যাত্রায় বেঁচে গিয়েছিল! "বলেছিল তোরা কী নিষ্ঠুর! কবির কাব্যপ্রবাহেও তোরা বাধা দিচ্ছিস। জোর করে তোরাই ঠিক করে দিতে চাস কাকে নিয়ে আমাকে কী লিখতে হবে!"
সুরসিক প্রমথেশ বলেছিল, "এসব নিয়ে আলোচনা যথাস্থানেই কোরো! শ্যামশ্রী অবশ্যই তোমার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার জন্যে সবসময় প্রস্তুত থাকবে।"
এসব কতদিন আগেকার কথা। কিন্তু প্রায়ই মনে পড়ে। এই মনে পড়ে যাওয়াটাই বয়স বাড়ার লক্ষণ। যা চলে গিয়েছে, যা কোনোদিন ফিরবে না তা স্মৃতির আয়নায় প্রতিফলিত দেখলে মন্দ লাগে না।

এইসব আকাশপাতাল ভাবছি, এমনসময় সেবার হঠাৎ চিঠি এলো। স্বয়ং সুমেধাই আমাকে নিজের হাতে চিঠি লিখেছে।
মুক্তোর মতো ঝকঝকে হাতের লেখা। সে লিখেছে, "তুমি এখন গল্প লেখায় হাত পাকিয়েছো। সাহিত্যিককে একবার দেখতে ইচ্ছে করে।..."
এতোদিন পরেও আমার সমস্ত শরীরে শিহরণ। আমি ভাবতে পারছি না, জীবনে আমি কোনোদিন এমন চিঠি পাবো যাতে সুমেধা নিজের হাতে আমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করবে।
সেই সুমেধা, যার সব ছিল। সুমেধা অবশ্যই রূপসী। কলেজের সবার দৃষ্টি সে কেড়ে নিতো। এ ব্যাপারে সুরজিতের বক্তব্য ছিল সোজাসুজি। "আমাদের সহপাঠিনী আমাদেরই অ্যাসেট। অন্য ক্লাশের কোনো হতভাগা সুমেধার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এ আমি সহ্য করবো না।"
প্রমথেশ তখনও বকেছে সুরজিৎকে। "কী সব আজে-বাজে কথা তুলছিস।"
সুরজিৎ বলেছে, "না ভাই, আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের চেষ্টা হলে আমাদের উঠে দাঁড়াতে হবে, সংগ্রাম চালাতে

• এরপর ৬৭ পৃষ্ঠায় •